আদ দুখান

৪৪

নামকরণ

সূরার ১০ নম্বর আয়াত يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ এর دُخَان শব্দকে এ সূরার শিরোনাম বানানো হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে دخان শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য বলছে, যে সময় সূরা 'যুখরুফ' ও তার পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা নাযিল হয়েছিলো। এ সূরাটিও সেই যুগেই নাযিল হয়। তবে এটি ঐগুলোর অল্প কিছুকাল পরে নাযিল হয়। এর ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে, মক্কার কাফেরদের বৈরী আচরণ যখন কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত একটি দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। নবী (সা) মনে করেছিলেন, এদের ওপর বিপদ আসলে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ভাল কথা শোনার জন্য মন নরম হবে। আল্লাহ নবীর (সা) দোয়া কবুল করলেন। গোটা অঞ্চলে এমন দুর্ভিক্ষ নেমে এলো যে, সবাই অস্থির হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত কতিপয় কুরাইশ নেতা—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যাদের মধ্যে বিশেষভাবে আবু সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন—নবীর (সা) কাছে এসে আবেদন জানালো যে, নিজের কওমকে এ বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এ অবস্থায় আল্লাহ এই সূরাটি নাযিল করেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এই পরিস্থিতিতে মক্কার কাফেরদের উপদেশ দান ও সতর্ক করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে বক্তব্য নাযিল করা হয় তার ভূমিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে ঃ

এক ঃ এই কুরআনকে তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা মনে করে ভুল করছো। এ গ্রন্থ তো তার আপন সত্তায় নিজেই এ বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষ যে তা কোন মানুষের নয়, বরং বিশ্ব জাহানের আল্লাহর রচিত কিতাব।

দুই ঃ তোমরা এই গ্রন্থের মর্যাদা ও মূল্য উপলব্ধি করতেও ভুল করছো। তোমাদের মতে এটা একটা মহাবিপদ। এ মহাবিপদই তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাঁর রহমতের ভিত্তিতে যে সময় সরাসরি তোমাদের কাছে তাঁর রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই মুহূর্তটি ছিল অতীব কল্যাণময়।

তিন ঃ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তোমরা এই ভুল ধারণার মধ্যে ডুবে আছো যে, এই রসূল এবং এই কিতাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে তোমরাই বিজয়ী হবে। অথচ এমন এক বিশেষ মুহূর্তে এই রসূলকে রিসালত দান ও এই কিতাব নাযিল করা হয়েছে যখন আল্লাহ সবার কিসমতের ফায়সালা করেন। আর আল্লাহর ফায়সালা এমন অথর্ব ও দুর্বল বস্তু নয় যে, ইচ্ছা করলে যে কেউ তা পরিবর্তিত করতে পারে। তাছাড়া তা কোন প্রকার মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রসূত হয় না যে, তাতে ভ্রান্তি ও অপূর্ণতার সম্ভাবনা থাকবে। তা তো বিশ্ব জাহানের শাসক ও অধিকর্তার অটল ফায়সালা যিনি সর্বশ্রোতা। সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করা কোন ছেলেখেলা নয়।

চার ঃ তোমরা নিজেরাও আল্লাহকে যমীন, আসমান এবং বিশ্ব জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক ও পালনকর্তা বলে মানো এবং একথাও মানো যে, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই এখতিয়ারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা অন্যদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণের জন্য গোঁ ধরে আছো। এর সপক্ষে এছাড়া তোমাদের আর কোন যুক্তি নেই যে, তোমার বাপ–দাদার সময় থেকেই এ কাজ চলে আসছে। অথচ কেউ যদি সচেতনভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহই মালিক ও পালনকর্তা এবং তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক মুখতার তাহলে কখনো তার মনে এ বিষয়ে সন্দেহ পর্যন্ত দানা বাঁধতে পারে না যে, তিনি ছাড়া আর কে–উপাস্য হওয়ার যোগ্য আছে। কিংবা উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে। তোমাদের বাপ–দাদা যদি এই বোকামি করে থাকে তাহলে চোখ বন্ধ করে তোমরাও তাই করতে থাকবে তার কোন যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে সেই এক আল্লাহ তাদেরও রব ছিলেন যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের যেমন সেই এক আল্লাহর দাসত্ব করা উচিত তাদেরও ঠিক তেমনি তাঁর দাসত্ব করা উচিত ছিল।

পাঁচ ঃ আল্লাহর রবুবিয়াত ও রহমতের দাবি এ নয় যে, তিনি শুধু তোমাদের পেট ভরাবেন। তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন তাও এর অন্তর্ভুক্ত। সেই পথ প্রদর্শনের জন্যই তিনি রসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন।

এই প্রারম্ভিক কথাগুলো বলার পর সেই সময় যে দুর্ভিক্ষ চলছিলো সে কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। এ দুর্ভিক্ষ এসেছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার ফলে। তিনি দোয়া করেছিলেন এই ধারণা নিয়ে যে বিপদে পড়লে কুরাইশদের বাঁকা ঘাড় সোজা হবে এবং তখন হয়তো তাদের কাছে উপদেশ বাণী কার্যকর হবে। সেই সময় এই প্রত্যাশ্যা কিছুটা পূরণ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিলো। কেননা, ন্যায় ও সত্যের বড় বড় ঘাড় বাঁকা দুশমনও দুর্ভিক্ষের আঘাতে বলতে শুরু করেছিলো, হে প্রভু, আমাদের ওপর থেকে এ বিপদ দূর করে দিন, আমরা ঈমান আনবো। এ অবস্থায় একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, এ রকম বিপদে পড়ে এরা ঈমান আনার লোক নয়। যে রসূলের জীবন, চরিত্র, কাজকর্ম এবং কথাবার্তায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছিলো যে তিনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল সেই রসূল থেকেই যখন এরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন শুধু একটি দুর্ভিক্ষ এদের গাফলতি ও অচৈতন্য কি করে দূর করবে? অপরদিকে কাফেরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমাদের ওপর থেকে এ আযাব সরিয়ে নিলেই তোমরা ঈমান আনবে, এটা তোমাদের চরম মিথ্যাচার। আমি এ আযাব সরিয়ে নিচ্ছি। এখনই বুঝা যাবে তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতিতে কতটা সত্যবাদী।

তোমাদের মাথার ওপরে দুর্ভাগ্য খেলা করছে। তোমরা একটি প্রচণ্ড আঘাত কামনা করছো। ছোট খাট আঘাতে তোমাদের বোধোদয় হবে না।

এ প্রসংগে পরে ফেরাউন ও তার কওমের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, বর্তমানে কুরাইশ নেতারা যে বিপদের সম্মুখীন তাদের ওপর ঠিক একই বিপদ এসেছিলো। তাদের কাছেও এ রকম একজন সম্মানিত রসূল এসিছিলেন। তারাও তাঁর কাছে থেকে এমন সব সুস্পষ্ট আলামত ও নিদর্শনাদি দেখেছিলো যা তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়া প্রমাণ করছিলো। তারাও একের পর এক নিদর্শন দেখেছে কিন্তু জিদ ও একগুঁয়েমি থেকে বিরত হয়নি। এমন কি শেষ পর্যন্ত রসূলকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। ফলে এমন পরিণাম ভোগ করেছে যা চিরদিনের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে আছে।

এরপর দ্বিতীয় যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আখেরাত, যা মেনে নিতে মক্কার কাফেরদের চরম আপত্তি ছিল। তারা বলতো ঃ আমরা কাউকে মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠে আসতে দেখিনি। আরেক জীবন আছে তোমাদের এ দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মৃত বাপ–দাদাকে জীবিত করে আনো। এর জবাবে আখেরাত বিশ্বাসের সপক্ষে সংক্ষিপ্তাকারে দুটি দলীল পেশ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, আখেরাত বিশ্বাসের অস্বীকৃতি সবসময় নৈতিক চরিত্রের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়েছে। আরেকটি হচ্ছে, বিশ্ব জাহান কোন খেলোয়াড়ের খেলার জিনিস নয়, বরং এটি একটি জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাপনা। আর জ্ঞানীর কোন কাজ অর্থহীন হয় না। তাছাড়া "আমাদের বাপ–দাদাদের জীবিত করে আনো" কাফেরদের এই দাবির জবাব দেয়া হয়েছে এই বলে যে, এ কাজটি প্রতি দিনই একেকজনের দাবী অনুসারে হবে না। আল্লাহ এ জন্য একটি সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। সেই সময় তিনি সমস্ত মানব জাতিকে যুগপত একত্রিত করবেন এবং নিজের আদালতে তাদের জবাবদিহি করাবেন। কেউ যদি সেই সময়ের চিন্তা করতে চায় তাহলে এখনই করুক। কারণ, সেখানে কেউ যেমন নিজের শক্তির জোরে রক্ষা পাবে না তেমনি কারো বাঁচানোতে বাঁচতে পারবে না।

আল্লাহর সেই আদালতের উল্লেখ করতে গিয়ে যারা সেখানে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবে তাদের কি হবে তা বলা হয়েছে এবং যারা সেখানে সফলকাম হবে তারা কি পুরস্কার লাভ করবে তাও বলা হয়েছে। সব শেষে কথার সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে, তোমাদের বুঝানোর জন্য পরিষ্কার ও সহজ–সরল ভংগিতে তোমাদের নিজের ভাষায় এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এখন যদি বুঝানো সত্ত্বেও তোমরা না বুঝো এবং চরম পরিণতি দেখার জন্যই গোঁ ধরে থাকো তাহলে অপেক্ষা করো। আমার নবীও অপেক্ষা করছেন। যা হওয়ার তা যথা সময়ে দেখতে পাবে।

حمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾

হা–মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, আমি এটি এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করেছি। কারণ, আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম।[১] এটা ছিল সেই রাত যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞোচিত ফায়সালা[২] দেয়া হয়ে থাকে।[৩] আমি একজন রসূল পাঠাতে যাচ্ছিলাম, তোমার রবের রহমত স্বরূপ।[৪] নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।[৫] তিনি আসমান ও যমীনের রব এবং আসমান ও যমীনের মাঝখানের প্রতিটি জিনিসের রব, যদি তোমরা সত্যিই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী হও।[৬] তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।[৭] তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।[৮] তোমাদের রব ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের রব যারা অতীত হয়ে গিয়েছেন।[৯] (কিন্তু বাস্তবে এসব লোকের দৃঢ় বিশ্বাস নেই) বরং তারা নিজেদের সন্দেহের মধ্যে পড়ে খেলছে।[১০]

১. কিতাবুম মুবীন বা সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ করার উদ্দেশ্য সূরা যুখরুফের ১ নম্বর টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে এখানেও যে বিষয়টির জন্য শপথ করা হয়েছে তা হলো এ কিতাবের রচিয়তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন, আমি নিজে। তার প্রমাণ

অন্য কোথাও অনুসন্ধান করার দরকার নেই, এ কিতাবই তার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এর পর আরো বলা হয়েছে, যে রাতে তা নাযিল করা হয়েছে সে রাত ছিল অত্যন্ত বরকত ও কল্যাণময়। অর্থাৎ যেসব নির্বোধ লোকদের নিজেদের ভালমন্দের বোধ পর্যন্ত নেই তারাই এ কিতাবের আগমনকে নিজেদের জন্য আকস্মিক বিপদ মনে করছে এবং এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড়ই চিন্তিত। কিন্তু গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকা লোকদের সতর্ক করার জন্য আমি যে মুহূর্তে এই কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাদের ও গোটা মানব জাতির জন্য সেই মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত সৌভাগ্যময়।

কোন কোন মুফাসসির সেই রাতে কুরআন নাযিল করার অর্থ গ্রহণ করেছেন এই যে, ঐ রাতে কুরআন নাযিল শুরু হয় আবার কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ গ্রহণ করেন, ঐ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন 'উম্মুল কিতাব' থেকে স্থানান্তরিত করে অহীর ধারক ফেরেশতাদের কাছে দেয়া হয় এবং পরে তা অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন মত ২৩ বছর ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হতে থাকে। প্রকৃত অবস্থা কি তা আল্লাহই ভাল জানেন।

ঐ রাত অর্থ সূরা কদরে যাকে 'লাইলাতুল কদর' বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ আর এখানে বলা হয়েছে إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ তাছাড়া কুরআন মজীদেই একথাও বলা হয়েছে যে, সেটি ছিল রমযান মাসের একটি রাত شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقره : ١٨٥) ।

২. মূল আয়াতে أَمْرٍ حَكِيمٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, সেই নির্দেশটি সরাসরি জ্ঞানভিত্তিক হয়ে থাকে। তাতে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতার সম্ভাবনা নেই। অপর অর্থটি হচ্ছে, সেটি অত্যন্ত দৃঢ় ও পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। তা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই।

৩. এ বিষয়টি সূরা কদরে বলা হয়েছে এভাবে ঃ

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

সেই রাতে ফেরেশতারা ও জিবরাঈল তাদের রবের আদেশে সব রকম নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়।

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় এটা এমন এক রাত যে রাতে তিনি ব্যক্তি, জাতি এবং দেশসমূহের ভাগ্যের ফায়সালা করে তাঁর ফেরেশতাদের কাছে দিয়ে দেন। পরে তারা ঐ সব ফায়সালা অনুসারে কাজ করতে থাকে। কতিপয় মুফাসসিরের কাছে এ রাতটি শা'বানের পনের তারিখের রাত বলে সন্দেহ হয়েছে তাদের মধ্যে হযরত ইকরিমার নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কারণ, কোন কোন হাদীসে এ রাত সম্পর্কে এ কথা উল্লেখ আছে যে, এ রাতেই ভাগ্যের ফায়সালা করা হয়। কিন্তু ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান বাসারী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবনে যায়েদ, আবু মালেক, দাহ্হাক এবং আরো অনেক মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এটা রমযানের সেই রাত যাকে "লাইলাতুল কদর" বলা হয়েছে। কারণ, কুরআন মজীদ

নিজেই সুস্পষ্ট করে তা বলছে। আর যে ক্ষেত্রে কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে 'আখবারে আহাদ* ধরনের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। ইবনে কাসীর বলেন ঃ এক শা'বান থেকে আরেক শা'বান পর্যন্ত ভাগ্যের ফায়সালা হওয়া সম্পর্কে 'উসমান ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণিত যে হাদীস ইমাম যুহরী উদ্ধৃত করেছেন তা একটি 'মুরসাল'** হাদীস। কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তির (نص) বিরুদ্ধে এ ধরনের হাদীস পেশ করা যায় না। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন ঃ শা'বানের পনের তারিখের রাত সম্পর্কে কোন হাদীসই নির্ভরযোগ্য নয়, না তার ফযীলত সম্পর্কে, না ঐ রাতে ভাগ্যের ফয়সালা হওয়া সম্পর্কে। তাই সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা উচিত। (আহকামুল কুরআন)।

৪. অর্থাৎ এই কিতাবসহ একজন রসূল পাঠানো শুধু জ্ঞান ও যুক্তির দাবীই ছিল না, আল্লাহর রহমতের দাবীও তাই ছিল। কারণ, তিনি রব। আর রবুবিয়াত শুধু বান্দার দেহের প্রতিপালন ব্যবস্থা দাবীই করে না, বরং নির্ভুল জ্ঞানানুযায়ী তাদের পথপ্রদর্শন করা, হক ও বাতলির পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে না দেয়ার দাবীও করে।

৫. এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহর এ দু'টি গুণ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য মানুষকে এ সত্য জানিয়ে দেয়া যে, কেবল তিনিই নির্ভুল জ্ঞান দিতে পারেন। কেননা, তিনিই সমস্ত সত্যকে জানেন। একজন মানুষ তো দূরের কথা সমস্ত মানুষ মিলেও যদি নিজেদের জন্য জীবন পদ্ধতি রচনা করে তবুও তার ন্যায়, সত্য ও বাস্তবানুগ হওয়ার কোন গ্যারান্টি নেই। কারণ, গোটা মানব জাতি এক সাথে মিলেও একজন سَمِيعٌ ও عَلِيمٌ (সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী) হয় না। একটি সঠিক ও নির্ভুল জীবন পদ্ধতি রচনার জন্য যেসব জ্ঞান ও সত্য জানা জরুরী তার সবগুলো আয়ত্ব করা তার সাধ্যাতীত। এরূপ পূর্ণ জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। তাই মানুষের জন্য কোন্‌টি হিদায়াত আর কোন্‌টি গোমরাহী, কোন্‌টি হক আর কোন্‌টি বাতিল এবং কোন্‌টি কল্যাণ আর কোন্‌টি অকল্যাণ তা তিনিই বলতে পারেন।

৬. আরববাসীরা নিজেরাই স্বীকার করতো, আল্লাহই গোটা বিশ্ব জাহান ও তার প্রতিটি জিনিসের রব (মালিক ও পালনকর্তা)। তাই তাদের বলা হয়েছে, যদি তোমরা না বুঝে শুনে এবং শুধু মৌখিকভাবে একথা না বলে থাকো, বরং প্রকৃতই যদি তাঁর প্রভুত্বের উপলব্ধি ও মালিক হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস তোমাদের থাকে তাহলে তোমাদের মেনে নেয়া উচিত যে, (১) মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য কিতাব ও রসূল প্রেরণ তাঁর রহমত ও প্রতিপালন গুণের অবিকল দাবী এবং (২) মালিক হওয়ার কারণে এটা তাঁর হক এবং তাঁর মালিকানাধীন হওয়ার কারণে তোমাদের কর্তব্য হলো, তাঁর পক্ষ থেকে যে হিদায়াত আসে তা মেনে চলো এবং যে নির্দেশ আসে তার আনুগত্য করো।

* আখবারে আহাদ বলতে এমন হাদীস বুঝায় যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রের কোনো এক স্তরে বর্ণনাকারী মাত্র একজন থাকে। এ বিষয়টি হাদীসের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কিছুটা দুর্বলতা সঞ্চার করে।

** যে হাদীসে মূল রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত থাকে না বরং তাবেঈ নিজেই রাসূলের (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা ছাড়া অন্য কোনো ইমামই এ ধরনের হাদীসকে নিসংকোচে গ্রহণ করেননি।

৭. উপাস্য অর্থ প্রকৃত উপাস্য। আর প্রকৃত উপাস্যের হক হচ্ছে তাঁর ইবাদত (দাসত্ব ও পূজা–অর্চনা) করতে হবে।

৮. এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং থাকতে পারে না। অতএব যিনি নিস্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে তোমাদের জীবন্ত মানুষ বানিয়েছেন এবং যিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক যে, যতক্ষণ ইচ্ছা তোমাদের এ জীবনকে টিকিয়ে রাখবেন এবং যখন ইচ্ছা এটা পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তোমরা তাঁর দাসত্ব করবে না, কিংবা তাঁর ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে অথবা তাঁর সাথে অন্যদেরও দাসত্ব করতে শুরু করবে তা সরাসরি বিবেক–বুদ্ধির পরিপন্থী।

৯. এখানে এ বিষয়ের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে যে, তোমাদের যে পূর্বসূরীরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাস্য বানিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের রবও তিনিই ছিলেন। তারা তাদের প্রকৃত রবকে বাদ দিয়ে অন্যদের দাসত্ব করে ঠিক কাজ করেনি। তাই তাদের অন্ধ অনুসরণ করে তোমরা ঠিকই করেছো এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে নিজেদের ধর্মের সঠিক হওয়ার যুক্তি–প্রমাণ বলে ধরে নেবে তা ঠিক নয়। তাদের কর্তব্য ছিল একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা। কারণ তিনিই ছিলেন তাদের রব। কিন্তু তারা যদি তা না করে থাকে তা হলে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সবার দাসত্ব পরিত্যাগ করে কেবল সেই এক আল্লাহর দাসত্ব করা। কারণ, তিনিই তোমাদের রব।

১০. এই সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশের মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। নাস্তিক হোক বা মুশরিক তাদের জীবনে মাঝে মধ্যে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন ভেতর থেকে তাদের মন বলে ওঠে ঃ তুমি যা বুঝে বসে আছো তার মধ্যে কোথাও না কোথাও অসংগতি বিদ্যমান। নাস্তিক আল্লাহকে অস্বীকার করার ব্যাপারে বাহ্যত যতই কঠোর হোক না কেন, কোন না কোন সময় তার মন এ সাক্ষ্য অবশ্যই দেয় যে, মাটির একটি পরমাণু থেকে শুরু করে নীহারিকা পুঞ্জ পর্যন্ত এবং একটি তৃণপত্র থেকে শুরু করে মানুষের সৃষ্টি পর্যন্ত এই বিস্ময়কর জ্ঞানময় ব্যবস্থা কোন মহাজ্ঞানী স্রষ্টা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। অনুরূপ একজন মুশরিক শিরকের যত গভীরেই ডুবে থাক না কেন তার মনও কোন না কোন সময় একথা বলে ওঠে, যাকে আমি উপাস্য বানিয়ে বসে আছি সে আল্লাহ হতে পারে না। মনের এই ভেতরের সাক্ষের ফলশ্রুতিতে না পারে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর তাওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে না পারে নাস্তিকতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ ও তা থেকে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে। ফলে বাহ্যিকভাবে তারা যত কঠোর ও দৃঢ় বিশ্বাসই প্রদর্শন করুক না কেন তাদের জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় সন্দেহের ওপরে। এখন প্রশ্ন হলো, এই সন্দেহ তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে না কেন এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও সন্তোষজনক ভিত্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য তারা ধীর ও ঠাণ্ডা মেজাজে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করে না কেন? এর জবাব হলো দীন বা জীবনাদর্শের ব্যাপারে তারা যে জিনিসটি থেকে বঞ্চিত হয় সেটি হচ্ছে ধীর ও ঠাণ্ডা মেজাজ। তাদের দৃষ্টিতে মূল গুরুত্ব লাভ করে শুধু পার্থিব স্বার্থ এবং তার ভোগের উপকরণ। এই বস্তুটি অর্জনের চিন্তা তারা তাদের মন–মগজ ও দেহের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ফেলে। এরপর থাকে জীবনাদর্শের ব্যাপার। সেটা তাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটা খেলা, একটা বিনোদন এবং একটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তারা

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

বেশ তো! সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করো, যে দিন আসমান পরিষ্কার ধোঁয়া নিয়ে আসবে এবং তা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এটা কষ্টদায়ক শাস্তি। (এখন এরা বলে) হে প্রভু, আমাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দাও। আমরা ঈমান আনবো। কোথায় এদের গাফলতি দূর হচ্ছে? এদের অবস্থা তো এই যে, এদের কাছে 'রসূলে মুবীন' এসেছেন।[১১] তা সত্ত্বেও এরা তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং বলেছে : এতো শিখিয়ে নেয়া পাগল।[১২] আমি আযাব কিছুটা সরিয়ে নিচ্ছি। এরপরও তোমরা যা আগে করছিলে তাই করবে। যেদিন আমি বড় আঘাত করবো, সেদিন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।[১৩]

আমি এর আগে ফেরাউনের কওমকেও এই পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। তাদের কাছে একজন সম্ভ্রান্ত রসূল এসেছিলেন।[১৪]

এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কয়েক মুহূর্তও ব্যয় করতে পারে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হলে বিনোদন হিসেবে পালন করা হচ্ছে। নিরীশ্বরবাদ ও নাস্তিকতা বিষয়ক বিতর্ক বিনোদন মূলক ভাবে করা হচ্ছে। দুনিয়ার ব্যস্ততার মধ্যে কার এত অবসর আছে যে বসে একটু ভেবে দেখবে, আমরা ন্যায় ও সত্যের প্রতি বিমুখ নই তো? আর যদি তা হই তাহলে পরিণামই বা কি?

১১. رسول مبين এর দুটি অর্থ। এক, তাঁর জীবন, তাঁর নৈতিক চরিত্র এবং তাঁর কাজকর্ম থেকে তাঁর রসূল হওয়া পুরোপুরি স্পষ্ট। দুই, তিনি প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে কোন ত্রুটি করেননি।

১২. তাদের কথার উদ্দেশ্য হলো, এ বেচারা তো ছিল সাদামাটা মানুষ। অন্য কিছু লোক তাকে নেপথ্য থেকে উৎসাহ যোগাচ্ছে। তারা আড়ালে থেকে কুরআনের আয়াত

রচনা করে একে শিখিয়ে দেয়। আর এ সাধারণ মানুষের কাছে এসে তা বলে ফেলে। তারা মজা করে লোক চক্ষুর অন্তরালে বসে থাকে আর এ গালমন্দ শোনে এবং পাথর খায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছরের পর বছর তাদের সামনে ক্রমাগত যেসব প্রমাণ, সদুপদেশ এবং যুক্তিপূর্ণ শিক্ষা পেশ করে ক্লান্ত প্রায় হয়ে পড়ছিলেন এভাবে একটি সস্তা কথা বলে তারা তা উড়িয়ে দিতো। কুরআন মজীদে যেসব যুক্তিপূর্ণ কথা বলা হচ্ছিলো তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতো না, আবার যিনি এসব কথা পেশ করছিলেন তিনি কেমন মর্যাদার লোক তাও দেখতো না। তাছাড়া এসব অভিযোগ আরোপের সময়ও এ কথা ভেবে দেখার কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতো না যে, তারা যা বলছে তা অর্থহীন কথাবার্তা কিনা। এটা সর্বজন বিদিত যে নেপথ্যে বসে শেখানোর মত অন্য কোন ব্যক্তি যদি থাকতো তাহলে তা খাদীজা (রা), আবু বকর (রা), আলী (রা), যায়েদ ইবনে হারেসা এবং প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী অন্যান্য মুসলমানদের কাছে কি করে গোপন থাকতো। কারণ তাদের চাইতে আর কেউ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ও সার্বক্ষণিক সাথী ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব লোকই নবীর (সা) সর্বাধিক ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন তারই বা কারণ কি? অথচ নেপথ্যে থেকে অন্য কারোর শেখানোর ওপর ভিত্তি করে নবুওয়াতের কাজ চালানো হয়ে থাকলে এসব লোকই সর্ব প্রথম তাঁর বিরোধিতা করতো। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহল, টীকা ১০৭; আল ফুরকান, টীকা ১২)।

১৩. এ আয়াত দুটির অর্থ বর্ণনায় মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং এই মতভেদ সাহাবাদের যুগেও ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) বিখ্যাত শাগরেদ মাসরুক বলেন : একদিন আমরা কুফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম এক বক্তা লোকদের সামনে বক্তৃতা করছে। সে يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاۤءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ পাঠ করলো। তারপর বলতে লাগলো : জানো, সে ধোঁয়া কেমন? এই ধোঁয়া কিয়ামতের দিন আসবে এবং কাফের ও মুনাফিকদের অন্ধ ও বধির করে দেবে। কিন্তু ঈমানদারদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হবে শুধু এতটুকু যেন সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে। তার এই বক্তব্য শুনে আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) কাছে গেলাম এবং তাকে বক্তার এই তাফসীর বর্ণনা করে শুনালাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ শুয়ে ছিলেন। এ তাফসীর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, কারো যদি জানা না থাকে তাহলে যারা জানে তাদের কাছে জেনে নেয়া উচিত। প্রকৃত ব্যাপার হলো, কুরাইশরা যখন ক্রমাগত ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতাই করে চলছিলো তখন তিনি এই বলে দোয়া করলেন : হে আল্লাহ, ইউসুফ আলাইহিস সালামের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। সুতরাং এমন কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, মানুষ হাড়, চামড়া এবং মৃতজন্তু পর্যন্ত খেতে শুরু করলো। তখনকার অবস্থা ছিল, যে ব্যক্তিই আসমানের দিকে তাকাতো ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে শুধু ধোঁয়াই দেখতে পেতো। অবশেষে আবু সুফিয়ান নবীর (সা) কাছে এসে বললো : আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার আহবান জানান আপনার কওম ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন এ বিপদ দূর করে দেন। এ যুগেই কুরাইশরা বলতে শুরু করেছিলো : হে আল্লাহ! আমাদের ওপর থেকে আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান আনবো। এ আয়াত দুটিতে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে। আর বড় আঘাত অর্থ

বদর যুদ্ধের দিন কুরাইশদের যে আঘাত দেয়া হয়েছিলো তাই। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ, বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম কতিপয় সনদে মাসরূক থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মাসরূক ছাড়া ইবরাহীম নাখায়ী, কাতাদা, আসেম এবং আমেরও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছিলেন। তাই এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এটিই ছিল তাঁর অভিমত। তাবেয়ীদের মধ্যে থেকে মুজাহিদ, কাতাদা, আবুল আলিয়া, মুকাতিল, ইবরাহীম নাখায়ী, দাহ্হাক, আতায়িতুল আওফী এবং অন্যরাও এ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অপর দিকে হযরত আলী, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী, যায়েদ ইবনে আলী এবং হাসান বাসারীর মত পণ্ডিতবর্গ বলেন ঃ এ আয়াতগুলোতে যে আলোচনা করা হয়েছে তা সবই কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের ঘটনা। আর এতে যে ধোঁয়ার কথা বলা হয়েছে তা সেই সময়েই পৃথিবীর ওপর ছেয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে যেসব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে সেই সব হাদীস থেকেও এ ব্যাখ্যা আরো দৃঢ়তা লাভ করে। হুযাইফা ইবনে আসীদ আল গিফারী বলেন ঃ একদিন আমরা পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলাম। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে হাজির হলেন এবং বললেন ঃ যতদিন না একের পর এক দশটি আলামত প্রকাশ পাবে ততদিন কিয়ামত হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ধোঁয়া, দাব্বা বা জন্তু, ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব, ঈসা ইবনে মারয়ামের অবতীর্ণ হওয়া, ভূমি ধ্বস, পূর্বে, পশ্চিমে ও আরব উপদ্বীপে এবং আদন থেকে আগুনের উৎপত্তি হওয়া যা মানুষকে তাড়া করে নিয়ে যাবে (মুসলিম)। ইবনে জারীর ও তাবারানীর উদ্ধৃত আবু মালেক আশআরী বর্ণিত হাদীস এবং ইবনে আবী হাতেম উদ্ধৃত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীসও এ বর্ণনা সমর্থন করে। এ দুটি হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধোঁয়াকে কিয়ামতের আলামতের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাছাড়া নবী (সা) এও বলেছেন যে, যখন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলবে তখন মু'মিনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হবে সর্দির মত। কিন্তু তা কাফেরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করবে এবং তার শরীরের প্রতিটি ছিদ্র ও নির্গমন পথ দিয়ে বের হয়ে আসবে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে এ দুটি ব্যাখ্যার গরমিল ও বৈপরিত্য সহজেই দূর হতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) ব্যাখ্যার ব্যাপারে বলা যায়, নবীর (সা) দোয়ার ফলে মক্কায় কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো যার ফলে কাফেরদের বিদ্রুপ ও উপহাসে কিছুটা ভাটা পড়েছিলো এবং দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য তারা নবীর (সা) কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়েছিলো। কুরআন মজীদের বেশ কিছু জায়গায় এ ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম ২৯, আল আরাফ ৭৭, ইউনুস ১৪, ১৫ ও ২৯ এবং আল মুমিনুন ৭২ টীকা)।

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমেও যে ঐ পরিস্থিরি প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। কাফেরদের উক্তি, "হে প্রভু, আমাদের ওপর থেকে এ আযাব সরিয়ে নিন, আমরা ঈমান আনবো।" আর আল্লাহর এ উক্তি, "কোথায় এদের গাফলতি দূর হচ্ছে? এদের

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى
اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ
هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ
الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾
وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ ۖ
وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا
كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾

তিনি বললেন[১৫] ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সোপর্দ করো।[১৬] আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।[১৭] আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। আমি তোমাদের কাছে (আমার নিযুক্তির) স্পষ্ট সনদ পেশ করছি।[১৮] তোমরা আমার ওপরে হামলা করে বসবে, এ ব্যাপারে আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি। তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তাহলে আমাকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকো।[১৯] অবশেষে তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, এসব লোক অপরাধী।[২০] (জবাব দেয়া হলো) বেশ, তাহলে রাতের মধ্যেই আমার বান্দাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।[২১] তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।[২২] সমুদ্রকে আপন অবস্থায় উন্মুক্ত থাকতে দাও। এই পুরো সেনাবাহিনী নিমজ্জিত হবে।[২৩] কত বাগ–বাগিচা, ঝর্ণাধারা, ফসল ও জমকালো প্রাসাদ তারা ছেড়ে গিয়েছে। তাদের পিছনে কত ভোগের উপকরণ পড়ে রাইলো যা নিয়ে তারা ফূর্তিতে মেতে থাকতো। এই হয়েছে তাদের পরিণাম। আমি অন্যদেরকে এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।[২৪] অতপর না আসমান তাদের জন্য কেঁদেছে না যমীন[২৫] এবং সামান্যতম অবকাশও তাদের দেয়া হয়নি।

অবস্থা তো এই যে, এদের কাছে 'রসূলে মুবীন' এসেছেন। তা সত্ত্বেও এরা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং বলেছে ঃ এতো শিখিয়ে নেয়া পাগল।" তাছাড়া এই উক্তিও যে,

"আমি আযাব কিছুটা সরিয়ে নিচ্ছি। এরপরও তোমরা আগে যা করছিলে তাই করবে।" এ ঘটনাগুলো নবীর (সা) যুগের হলে কেবল সেই পরিস্থিতিতেই এসব কথা খাপ খায়। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে এমন ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এসব কথার প্রয়োগ বোধগম্য নয়। তাই ইবনে মাসউদের (রা) ব্যাখ্যার এতটুকু অংশ সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু ধোঁয়াও সেই যুগেই প্রকাশ পেয়েছিলো এবং প্রকাশ পেয়েছিলো এমনভাবে যে, ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে মানুষ যখন আসমানের দিকে তাকাতো তখন শুধু ধোঁয়াই দেখতে পেতো, তার ব্যাখ্যার এই অংশটুকু সঠিক বলে মনে হয় না। একথা কুরআন মজীদের বাক্যের সাথেও বাহ্যত খাপ খায় না এবং হাদীসসমূহেরও পরিপন্থী। কুরআনে একথা কোথায় বলা হয়েছে যে, আসমান ধোঁয়া নিয়ে এসেছে এবং মানুষের ওপর ছেয়ে গিয়েছে? সেখানে তো বলা হয়েছে, 'বেশ, তাহলে সেই দিনটির অপেক্ষা করো যেদিন আসমান সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে এবং তা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।' পরবর্তী আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার করলে এ বাণীর পরিষ্কার অর্থ যা বুঝা যায় তা হচ্ছে, তোমরা যখন উপদেশও মানছো না এবং দুর্ভিক্ষের আকারে যেভাবে তোমাদের সতর্ক করা হলো তাতেও সম্বিত ফিরে পাচ্ছো না, তাহলে কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো। সেই সময় যখন দুর্ভাগ্য ষোলকলায় পূর্ণ হবে তখন তোমরা ঠিকই বুঝতে পারবে হক কি আর বাতিল কি? সুতরাং ধোঁয়া সম্পর্কে সঠিক কথা হলো তা দুর্ভিক্ষকালীন সময়ের জিনিস নয়, বরং তা কিয়ামতের একটি আলামত। হাদীস থেকেও একথাই জানা যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বড় বড় মুফাসসিরদের মধ্যে যারা হযরত ইবনে মাসউদের মত সমর্থন করেছেন তারা তাঁর পুরো বক্তব্যই সমর্থন করেছেন। আবার যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তারাও পুরোটাই প্রত্যাখ্যান করে বসেছেন। অথচ কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে এর কোন্ অংশ ঠিক এবং কোন্ অংশ ভুল তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

১৪. মূল আয়াতে رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। كريم শব্দটি যখন মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন তার দ্বারা বুঝানো হয় এমন ব্যক্তিকে যে অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্ট আচার–আচরণ এবং অতীব প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী। সাধারণ গুণাবলী বুঝাতে এ শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

১৫. প্রথমেই একথা বুঝে নেয়া দরকার যে, এখানে হযরত মূসার যেসব উক্তি ও বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তা যুগপৎ একই ধারাবাহিক বক্তব্যের বিভিন্ন অংশ নয়, বরং বছরের পর বছর দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে যেসব কথা তিনি ফেরাউন ও তার সভাসদদের বলেছিলেন তার সারসংক্ষেপ কয়েকটি মাত্র বাক্যে বর্ণনা করা হচ্ছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, টীকা ৮৩ থেকে ৯৭; ইউনুস, টীকা ৭২ থেকে ৯৩; ত্বাহা, টীকা ১৮ (ক) থেকে ৫২; আশ শুআরা, টীকা ৭ থেকে ৪৯; আন নামল, টীকা ৮ থেকে ১৭; আল কাসাস, টীকা ৪৬ থেকে ৫৬; আর মু'মিন, আয়াত ২৩ থেকে ৪৬; আয যুখরুফ, আয়াত ৪৬ থেকে ৫৬ টীকাসহ)।

১৬. মূল আয়াতে ادوا الى عباد الله বলা হয়েছে। এ আয়াতাংশের একটি অনুবাদ আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। এই অনুবাদ অনুসারে এটা ইতিপূর্বে সূরা আ'রাফ (আয়াত ১৫), সূরা ত্বাহা (৪৭) এবং আশ শুআরায় বনী ইসরাঈলদের আমার সাথে যেতে দাও বলে

যে দাবী করা হয়েছে সেই দাবীর সমার্থক। আরেকটি 'অনুবাদ' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে উদ্ধৃত। অনুবাদটি হলো, হে আল্লাহর বান্দারা, আমার হক আদায় করো অর্থাৎ আমার কথা মেনে নাও, আমার প্রতি ঈমান আনো এবং আমার হিদায়াত অনুসরণ করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর এটা আমার হক। পরের বাক্যাংশ অর্থাৎ "আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল" এই দ্বিতীয় অর্থের সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৭. অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রসূল। নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা সংযোজন করে বলার মত ব্যক্তিও আমি নই কিংবা নিজের কোন ব্যক্তিগত আকাংখা বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজেই একটি নির্দেশ বা আইন রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়ারমত ব্যক্তিও নই। তোমরা আমার ওপর এতটা আস্থা রাখতে পার যে, আমার প্রেরণকারী যা বলেছেন কমবেশী না করে ঠিক ততটুকুই আমি তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দেব। (প্রকাশ থাকে যে হযরত মূসা সর্বপ্রথম যখন তাঁর দাওয়াত পেশ করেছিলেন তখন এই দুটি কথা বলেছিলেন)।

১৮. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করছো প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কারণ, আমার যেসব কথা শুনে তোমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছো তা আমার নয়, আল্লাহর কথা। আমি তাঁর রসূল হিসেবে এসব কথা বলছি। আমি আল্লাহর রসূল কিনা এ ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে আমি তোমাদের সামনে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছি। এই প্রমাণ বলতে কোন একটি মাত্র মু'জিযা বুঝানো হয়নি। বরং ফেরাউনের দরবারে প্রথমবার পৌছার পর থেকে মিসরে অবস্থানের সর্বশেষ সময় পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে যেসব মু'জিযা মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউন ও তার কওমকে দেখিয়েছেন তার সবগুলোকে বুঝানো হয়েছে। তারা যে প্রমাণটিই অস্বীকার করেছে তিনি পরে তার চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আয যুখরুফ, টীকা নম্বর ৪২ ও ৪৩)।

১৯. এটা সেই সময়ের কথা যখন হযরত মূসার পেশকৃত সমস্ত নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও ফেরাউন তার জিদ ও হঠকারিতা বজায় রেখে চলছিলো। কিন্তু মিসরের সাধারণ ও অসাধারণ সব মানুষই প্রতিনিয়ত এসব নিদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে দেখে সে অস্থির হয়ে উঠছিলো। সেই যুগেই প্রথমে সে ভরা দরবারে বক্তৃতা করে যা সূরা যুখরুফের ৫১ থেকে ৫৩ আয়াতে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে (দেখুন, সূরা যুখরুফের ৪৫ থেকে ৪৯ টীকা)। তারপর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে দেখে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর রসূলকে হত্যা করতে মনস্থ করে। ঐ সময় হযরত মূসা (আ) সেই কথাটি বলেছিলেন যা সূরা মু'মিনের ২৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ –

"যে অহংকারী জবাবদিহির দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না আমি তার থেকে আশ্রয় গ্রহণ করেছি আমার ও তোমাদের যিনি রব, তার কাছে।"

এখানে হযরত মূসা (আ) তাঁর সেই কথা উল্লেখ করে ফেরাউন ও তার রাজকীয় সভাসদদের বলছেন, দেখো, আমি তোমাদের সমস্ত হামলার মোকাবিলার জন্য ইতিপূর্বেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আশ্রয় চেয়েছি। এখন তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণ কামনা করো তাহলে আমার ওপর হামলা করা থেকে বিরত থাকো। আমার কথা মানতে না চাইলে না মানো। আমাকে কখনো আঘাত করবে না। অন্যথায়, ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

২০. এটা হযরত মূসা কর্তৃক তাঁর রবের কাছে পেশকৃত সর্বশেষ রিপোর্ট। 'এসব লোক অপরাধী' অর্থাৎ এদের অপরাধী হওয়াটা এখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। এদের প্রতি আনুকূল্য দেখানো এবং এদেরকে সংশোধনের সুযোগ দানের অবকাশ আর নেই। এখন জনাবের চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়ার সময় এসে গিয়েছে।

২১. অর্থাৎ সেই সব লোককে যারা ঈমান এনেছে। তাদের মধ্যে বনী ইসরাঈলও ছিল এবং হযরত ইউসুফের যুগ থেকে হযরত মূসার যুগের আগমন পর্যন্ত মিসরের যেসব কিবতী মুসলমান হয়েছিলো তারাও। আবার সেই সব মিসরীয় লোকও যারা হযরত মূসার নিদর্শনসমূহ দেখে এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউসুফ, টীকা ৫৮)

২২. এটা হযরত মূসাকে হিজরতের জন্য দেয়া প্রাথমিক নির্দেশ। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বাহা, টীকা ৫৩; আশ শুআরা টীকা ৩৯ থেকে ৪৭)।

২৩. এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সেই সময় যখন হযরত মূসা তাঁর কাফেলাসহ সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছেন এবং তিনি চাচ্ছিলেন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে যাওয়ার আগে তা যেমন ছিল লাঠির আঘাতে পুনরায় তেমন করে দেবেন। যাতে মু'জিযার সাহায্যে যে রাস্তা তৈরী হয়েছে ফেরাউন ও তার সৈন্য–সামন্ত সেই রাস্তা ধরে এসে না পড়ে। সেই সময় বলা হয়েছিলো, তা যেন না করা হয়। সমুদ্রকে ঐভাবেই বিভক্ত থাকতে দাও, যাতে ফেরাউন তার সৈন্য–সামন্ত নিয়ে এই রাস্তায় নেমে আসে। তারপর সমুদ্রের পানি ছেড়ে দিয়ে এই গোটা সেনাবাহিনীকে ডুবিয়ে মারা হবে।

২৪. হযরত হাসান বাসারী বলেন ঃ এর অর্থ বনী ইসরাঈল, যাদেরকে ফেরাউনের কওমের ধ্বংসের পর আল্লাহ মিসরের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। কাতাদা বলেন ঃ এর অর্থ অন্য জাতির লোক, যারা ফেরাউনের অনুসারীদের ধ্বংস করার পরে মিসরের উত্তরাধিকারী হয়েছিলো। কারণ, ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ নেই যে, মিসর থেকে বের হওয়ার পর বনী ইসরাঈলরা আর কখনো সেখানে ফিরে গিয়েছিলো এবং সে দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলো। পরবর্তীকালের মুফাসসিরদের মধ্যেও এই মতভেদ দেখা যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শুআরা, টীকা ৪৫)।

২৫. অর্থাৎ তারা যখন শাসক ছিল তখন তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজতো। পৃথিবীতে তাদের প্রশংসা গীত প্রতিধ্বনিত হতো। তাদের আগে ও পিছে চাটুকারদের ভিড় লেগে থাকতো। তাদের এমন ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা হতো যেন গোটা জগতই তাদের গুণাবলীর ভক্ত–অনুরক্ত, তাদের দয়া ও করুণার দানে ঋণী এবং পৃথিবীতে তাদের চেয়ে জনপ্রিয় আর কেউ নেই। কিন্তু যখন তাদের পতন হলো একটি চোখ থেকেও তাদের জন্য

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَءَاتَيْنَٰهُم مِّنَ ٱلْءَايَٰتِ مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٌا۟ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾

২ রুকূ’

এভাবে আমি বনী ইসরাঈলদের কঠিন অপমানজনক আযাব, ফেরাউন[২৬] থেকে নাযাত দিয়েছিলাম। সীমালংঘনকারীদের মধ্যে সে ছিল প্রকৃতই উচ্চ পর্যায়ের লোক।[২৭] তাদের অবস্থা জেনে শুনেই আমি দুনিয়ার অন্য সব জাতির ওপর তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম।[২৮] তাদেরকে এমন সব নিদর্শন দেখিয়েছিলাম যার মধ্যে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।[২৯]

এরা বলে ঃ আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। এরপর আমাদের পুনরায় আর উঠানো হবে না।[৩০]

অশ্রুপাত হয়নি বরং সবাই প্রাণ ভরে এমন শ্বাস নিয়েছে যেন তার পাঁজরে বিদ্ধ কাঁটাটি বের হয়ে গিয়েছে। একথা সবারই জানা, তারা আল্লাহর বান্দাদের কোন কল্যাণ করেনি যে তারা তার জন্য কাঁদবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যও কোন কাজ করেনি যে, আসমান–বাসীরা তাদের ধ্বংসের কারণে আহাজারি করবে। আল্লাহর ইচ্ছানুসারে যতদিন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তারা পৃথিবীর বুকের ওপর দুর্বলদের অত্যাচার করেছে। কিন্তু তাদের অপরাধের মাত্রা সীমালংঘন করলে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে যেমন ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়।

২৬. অর্থাৎ তাদের জন্য ফেরাউন নিজেই ছিল লাঞ্ছনাকর আযাব। অন্য সব আযাব ছিল এই মূর্তিমান আযাবের শাখা–প্রশাখা।

২৭. এর মধ্যে কুরাইশ গোত্রের কাফের নেতাদেরকে সূক্ষ্মভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে। অর্থাৎ দাসত্বের সীমালংঘনকারীদের মধ্যে তোমরা কি এমন মর্যাদার অধিকারী? অতি বড় বিদ্রোহী তো ছিল সেই যে তৎকালীন পৃথিবীর সবচাইতে বড় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে খোদায়ীর দাবী নিয়ে বসেছিলো। তাকেই যখন খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে তোমাদের এমন কি অস্তিত্ব আছে যে আল্লাহর আযাবের সামনে টিকে থাকেব?

২৮. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের গুণাবলী ও দুর্বলতা উভয় দিকই আল্লাহর জানা ছিল। তিনি না দেখে শুনে অন্ধভাবে তাদেরকে বাছাই করেননি। সেই সময় পৃথিবীতে যত জাতি ছিল তাদের মধ্য থেকে তিনি এই জাতিকে যখন তাঁর বার্তাবাহক এবং তাওহীদের

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

"যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের বাপ–দাদাদের জীবিত করে আনো।[৩১] 'এরাই উত্তম না তুব্বা' কওম[৩২] এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা? আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম। কারণ তারা অপরাধী হয়ে গিয়েছিলো।[৩৩] আমি এই আসমান ও যমীন এবং এর মাঝের সমস্ত জিনিস খেলাচ্ছলে তৈরী করিনি। এসবই আমি যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।[৩৪] এদের সবার পুনরুজ্জীবনের জন্য নির্ধারিত সময়টিই এদের ফায়সালার দিন।[৩৫] সেটি এমন দিন যেদিন কোন নিকটতম প্রিয়জনও[৩৬] কোন নিকটতম প্রিয়জনের কাজে আসবে না এবং আল্লাহ যাকে রহমত দান করবেন সে ছাড়া তারা কোথাও থেকে কোন সাহায্য লাভ করবে না। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও অত্যন্ত দয়াবান।[৩৭]

দাওয়াতের ঝাণ্ডাবাহী বানানোর জন্য মনোনীত করলেন তখন তা করেছিলেন এ জন্য যে, তাঁর জ্ঞানে তৎকালীন জাতিসমূহের মধ্যে এরাই তার উপযুক্ত ছিল।

২৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৬৪ থেকে ৮৫; আন নিসা, টীকা ১৮২ থেকে ১৯৯; আল মায়েদা, টীকা ৪২ থেকে ৪৭; আল আ'রাফ, টীকা ৯৭ থেকে ১৩; ত্বাহা, টীকা ৫৬ থেকে ৭৪।

৩০. অর্থাৎ প্রথমবার মরার পরই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। তারপর আর কোন জীবন নেই। 'প্রথম মৃত্যু' কথা দ্বারা একথা বুঝায় না যে, এরপর আরো মৃত্যু আছে। আমরা যখন বলি, অমুক ব্যক্তির প্রথম সন্তান জন্ম নিয়েছে তখন একথা সত্য হওয়ার জন্য জরুরী নয় যে, এরপর অবশ্যই তার দ্বিতীয় সন্তান জন্ম নেবে। একথার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে তার কোন সন্তান হয়নি।

৩১. তাদের যুক্তি ছিল এই যে, মৃত্যুর পর আমরা কখনো কাউকে পুনরায় জীবিত হতে দেখিনি। তাই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন হবে না। তোমরা যদি দাবী করো, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন হবে তাহলে আমাদের বাপদাদাদের কবর থেকে উঠিয়ে আনো যাতে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তোমরা যদি তা না করো তাহলে আমরা মনে করবো তোমাদের দাবী ভিত্তিহীন। তাদের মতে এটা যেন মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করার মজবুত প্রমাণ। অথচ এটি একেবারেই নিরর্থক কথা। কে তাদেরকে একথা বলেছে যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে আবার এই দুনিয়াতেই ফিরে আসবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কোন মুসলমান কবে এ দাবী করেছিলো যে, আমরা মৃতদের জীবিত করতে পারি?

৩২. হিময়ার গোত্রের বাদশাহদের উপাধি ছিল তুব্বা' যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের উপাধি ছিল কিসরা, কায়সার, ফেরাউন প্রভৃতি। তুব্বা' কওম সাবা কওমের একটি শাখার সাথে সম্পর্কিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১১৫ সনে এরা সাবা দেশটি দখল করে এবং ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তা শাসন করে। শত শত বছর ধরে আরবে এদের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী সবার মুখে মুখে ছিল (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, টীকা ৩৭)।

৩৩. এটা কাফেরদের আপত্তির প্রথম জবাব। এ জবাবের সারকথা হচ্ছে, আখেরাত অস্বীকৃতি এমনই জিনিস যা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিকে অপরাধী না বানিয়ে ছাড়ে না। নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া এর অনিবার্য ফল। মানবেতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে জাতিই জীবন সম্পর্কে এই মতবাদ গ্রহণ করেছে পরিণামে সে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন বাকি থাকে এই প্রশ্নটির ব্যাখ্যা, যে, "এরাই উত্তম না তুব্বা' কওম এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা?" এর অর্থ হচ্ছে, তুব্বা' কওম তার পূর্বের সাবা ও ফেরাউনের কওম এবং আরো অন্য কওম যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং গৌরব ও শান-শওকত অর্জন করেছিলো মক্কার এই কাফেররা তার ধারে কাছেও পৌছতে পারেনি। কিন্তু এই বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পার্থিব গৌরব ও জাঁকজমক নৈতিক অধপতনের ভয়াবহ পরিণাম থেকে কবে তাদের রক্ষা করতে পেরেছিলো যে, তারা নিজেদের সামান্য পুঁজি এবং উপায়-উপকরণের জোরে তা থেকে রক্ষা পাবে? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, টীকা ২৫ ও ৩৬)।

৩৪. এটা তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। এর সারমর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তিই মৃত্যুর পরের জীবন এবং আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তিকে অস্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে সে এই বিশ্ব সংসারকে খেলনা এবং তার স্রষ্টাকে নির্বোধ শিশু মনে করে। তাই সে এই সিদ্ধান্তে পৌছে যে, মানুষ এই পৃথিবীতে সব কিছু করে একদিন এমনি মাটিতে মিশে যাবে এবং তার ভাল বা মন্দ কাজের কোন ফলাফল দেখা দেবে না। অথচ এই বিশ্ব জাহান কোন খেলোয়াড়ের সৃষ্টি নয়, এক মহাজ্ঞানী স্রষ্টার সৃষ্টি। মহাজ্ঞানী সত্তা কোন অর্থহীন কাজ করবেন তা আশা করা যায় না। আখেরাত অস্বীকৃতির জবাবে কুরআনের বেশ কয়েকটি স্থানে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে এবং আমরা তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও পেশ করেছি (দেখুন, তাফহীমূল কুরআন, আল আনয়াম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১০ ও ১১; আল আম্বিয়া, টীকা ১৬ ও ১৭; আল মু'মিনুন, টীকা ১০১ ও ১০২; আর রূম, টীকা ৪ থেকে ১০)।

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾
كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ
رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾
إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৩ রুকূ'

'যাক্কূম'[৩৮] গাছ হবে গোনাগারদের খাদ্য। তেলের তলানির মত।[৩৯] পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলাতে থাকবে যেমন ফুটন্ত পানি উথলায়। পাকড়াও করো একে এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যখানে। তারপর ঢেলে দাও তার মাতার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব। এখন এর মজা চাখো। তুমি বড় সম্মানী ব্যক্তি কিনা, তাই। এটা সেই জিনিস যার আমার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।

৩৫. এটা তাদের এই দাবীর জবাব যে, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের বাপ–দাদাদের জীবিত করে আনো। অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন কোন তামাশা নয় যে, যেখানেই কেউ তা অস্বীকার করবে তখনি কবরস্থান থেকে একজন মৃতকে জীবিত করে তাদের সামনে এনে হাজির করা হবে। বিশ্ব জাহানের রব এ জন্য একটি সময় বেঁধে দিয়েছেন। সেই সময় তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সবাইকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর আদালতে সমবেত করবেন এবং তাদের মোকদ্দমার রায় ঘোষণা করবেন। তোমরা বিশ্বাস করো কিংবা না–ই করো, এ কাজ নির্দিষ্ট সময়েই হবে। তোমরা বিশ্বাস করলে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। কারণ, এভাবে সময় থাকতেই সতর্ক হয়ে ঐ আদালতে সফলকাম হওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারবে। বিশ্বাস না করলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। কারণ সে ক্ষেত্রে এই ভুলের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করবে যে ভাল–মন্দ যাই আছে এই দুনিয়া পর্যন্তই তা সীমাবদ্ধ। মৃত্যুর পর কোন আদালত হবে না যেখানে আমাদের ভাল অথবা মন্দ কাজকর্মের স্থায়ী কোন ফল থাকতে পারে।

৩৬. মূল আয়াতে مولى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়, যে কোন সম্পর্কের কারণে অন্য কোন ব্যক্তিকে সহযোগিতা করে। সেই সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক কিংবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোন প্রকারের সম্পর্ক হোক তা দেখার বিষয় নয়।

৩৭. ফায়সালার দিন যে আদালত কায়েম হবে তা কেমন প্রকৃতির হবে সে কথা এই আয়াতাংশগুলোতে বলা হয়েছে। সেদিন কারো সাহায্য–সহযোগিতা কোন অপরাধীকে রক্ষা করতে কিংবা তার শাস্তি হ্রাস করতে পারবে না। নিরংকুশ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

আল্লাহভীরু লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গায় থাকবে[৪০] বাগান ও ঝর্ণা ঘেরা জায়গায়। তারা রেশম ও মখমলের[৪১] পোশাক পরে সামনাসামনি বসবে। এটা হবে তাদের অবস্থা। আমি সুন্দরী হরিণ নয়না[৪২] নারীদের সাথে তাদের বিয়ে দেবো। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে মনের সুখে সবরকম সুস্বাদু জিনিস চেয়ে চেয়ে নেবে।[৪৩] সেখানে তারা কখনো মৃত্যুর স্বাদ চাখবে না। তবে দুনিয়াতে যে মৃত্যু এসেছিলো তা তো এসেই গেছে। আর আল্লাহ তাঁর করুণায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।[৪৪] এটাই বড় সফলতা।

হে নবী, আমি এই কিতাবকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যাতে এই লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। এখন তুমিও অপেক্ষা করো, এরাও অপেক্ষা করছে।[৪৫]

সত্যিকার সেই বিচারকের হাতে থাকবে যার সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়া রোধ করার শক্তি কারো নেই এবং যার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও কারো নেই। তিনি দয়াপরবশ হয়ে কাকে শাস্তি দিবেন না আর কাকে কম শাস্তি দিবেন এটা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজের বিচার–বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে। ইনসাফ করার ক্ষেত্রে তিনি দয়ামায়াহীনতা নয় বরং দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেন এবং এটাই তাঁর নীতি। কিন্তু যার মোকদ্দমায় যে ফায়সালাই তিনি করবেন তা সর্বাবস্থায় অবিকল কার্যকর হবে। আল্লাহর আদালতের এই অবস্থা বর্ণনা করার পর যারা ঐ আদালতে অপরাধী প্রমাণিত হবে তাদের পরিণাম কি হবে এবং যাদের সম্পর্কে প্রমাণিত হবে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকেছে তাদেরকে কি কি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে ছোট ছোট কয়েকটি বাক্যে তা বলা হয়েছে।

৩৮. 'যাক্কুম'–এর ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফফাত, টীকা ৩৪।

৩৯. মূল আয়াতে المهل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার কয়েকটি অর্থ আছে ঃ গলানো ধাতু, পুঁজ, রক্ত, গলানো আলকাতরা, লাভা এবং তেলের তলানি। আরবী ভাষাভাষী এবং মুফাসসিরগণ এই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। আমাদের দেশে যাকে ফনীমনসা বলা হয় 'যাক্কুম' বলতে যদি সেই জিনিসকেই বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে তা চিবালে যে রস নির্গত হবে তা তেলের তলানির সাথে বেশী সাদৃশ্য পূর্ণ হবে।

৪০. শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গা অর্থ এমন জায়গা যেখানে কোন প্রকার আশংকা থাকবে না। কোন দুঃখ, অস্থিরতা, বিপদ, আশংকা এবং পরিশ্রম ও কষ্ট থাকবে না। হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীদের বলে দেয়া হবে, তোমরা এখানে চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না, চিরদিন জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না, চিরদিন সুখী থাকবে, কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হবে না এবং চিরদিন যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না।" (মুসলিম—আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীস)।

৪১. মূল আয়াতে سُنْدُسٍ ও اِسْتَبْرَقٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়কে سندس বলে। اِستبرق ফারসী শব্দ এর আরবী রূপ। মোটা রেশমী কাপড় বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৪২. মূল শব্দ হচ্ছে حُوْرٌعِيْنٌ । حُوْر শব্দটি حَوْراء শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় সুন্দরী নারীকে حَوْراء বলা হয়। عين শব্দটি عيناء শব্দের বহুবচন। এ শব্দটি বড় চোখ বিশিষ্ট নারীদের বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেকুন, সূরা সাফ্ফাত, টীকা ২৬ ও ২৯)।

৪৩. 'নিশ্চিন্তে মনের সুখে' চাওয়ার অর্থ যে জিনিস যত পরিমাণে ইচ্ছা দ্বিধাহীনভাবে জান্নাতের খাদেমদেরকে তা আনার নির্দেশ দেবে এবং তা এনে হাজির করা হবে। দুনিয়াতে হোটেল তো দূরের কথা কোন ব্যক্তি নিজের বাড়ীতেও এরূপ নিশ্চিন্তে ও মনের সুখে কোন কিছু এমনভাবে চাইতে পারে না যেমন সে জান্নাতে চাইবে। কারণ, এখানে কারো কাছেই কোন জিনিসের অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে না। এবং ব্যক্তি যাই ব্যবহার করে তার মূল্য তাকে নিজের পকেট থেকে দিতে হয়। জান্নাতে সম্পদ হবে আল্লাহর এবং ব্যক্তিকে তা ব্যবহারের অবাধ অনুমতি দেয়া হবে। কোন জিনিসের ষ্টক শেষ হয়ে যাওয়ার বিপদ যেমন থাকবে না তেমনি পরে বিল আসারও কোন প্রশ্ন থাকবে না।

৪৪. এ আয়াতে দুটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ

এক—জান্নাতের নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করার পর জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার কথা আলাদা করে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। অথচ কোন ব্যক্তির জান্নাত লাভ করাই আপনা আপনিই তার জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়াকে অনিবার্য করে তোলে। এর কারণ, মানুষ আনুগত্যের পুরস্কারের মূল্য পুরোপুরি তখনই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যখন নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে সে কোথায় পৌছেছে এবং কোন ধরনের মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়েছে তা তার সামনে থাকে।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, এ লোকদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করাকে আল্লাহ তাঁর দয়ার ফলশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করছেন। এর দ্বারা মানুষকে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর অনুগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির ভাগ্যেই এই সফলতা আসতে পারে না। ব্যক্তি তার সৎকর্মের পুরস্কার লাভ করবে। কিন্তু প্রথমত আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ব্যক্তি তার সৎকর্ম করার তাওফীক বা সামর্থ কিভাবে লাভ করবে। তাছাড়া ব্যক্তি দ্বারা যত উত্তম কাজই সম্পন্ন হোক না কেন তা পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণতর হতে পারে না। সুতরাং সে কাজ সম্পর্কে দাবী করে একথা বলা যাবে না যে, তাতে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা নেই। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে তিনি বান্দার দুর্বলতা এবং তার কাজকর্মের অপূর্ণতাসমূহ উপেক্ষা করে তার খেদমত কবুল করেন এবং তাকে পুরস্কৃত করে ধন্য করেন। অন্যথায়, তিনি যদি সূক্ষ্মভাবে হিসেব নিতে শুরু করেন তাহলে কার এমন দুঃসাহস আছে যে নিজের বাহুবলে জান্নাত লাভ করার দাবী করতে পারে? হাদীসে একথাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا ان احدا لن يدخله عمله الجنة

"আমল করো এবং নিজের সাধ্যমত সর্বাধিক সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো। জেনে রাখো, কোন ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।"

লোকেরা বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনার আমলওকি পারবে না? তিনি বললেন ঃ

ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته

"হাঁ, আমিও শুধু আমার আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবো না। তবে আমার রব যদি তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করেন।"

৪৫. অর্থাৎ এখন যদি এসব লোক উপদেশ গ্রহণ না করে তাহলে দেখো, কিভাবে তাদের দুর্ভাগ্য আসে। আর তোমার এই দাওয়াতের পরিণাম কি হয় তা দেখার জন্য এরাও অপেক্ষমান।